

হালখাতা

আজ পয়লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হালখাতায়। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেবনিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি, এবং তার প্রথম পাতায় পুরনো খাতার জের টেনে আনি।

বৎসরের পর বৎসর যায়, আবার বৎসর আসে; কিন্তু আমাদের নূতন খাতায় কিছু নূতন লাভের কথা থাকে না। আমরা এক হালখাতা থেকে আর এক হালখাতায় শুধু লোকসানের ঘরটা বাড়িয়ে চলেছি। এভাবে আর কিছুদিন চললে যে আমাদের জাতকে দেউলে হতে হবে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। লাভের দিকে শূণ্য ও লোকসানের দিকে অঙ্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তবে আমরা ব্যাবসা গুটিয়ে নিই নে কেন। কারণ ভবের হাতে দোকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশা আছে। লোকে বলে, আশা না মলে যায় না।

আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। গেল বৎসর, জাতি-হিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈজ্ঞ বড়, এই নিয়ে একটা তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা অপরের তুলনায় সকল হিসেবেই ছোট, সেইজন্ম আমাদের নিজেদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়া আর উপায় নেই। নিজেকে বড় বলে পরিচয় দেবার মায়া আমরা ছাড়তে পারি নে। কায়স্থ বলেন, আমি বড়; বৈজ্ঞ বলেন, আমি বড়। শাস্ত্রে যখন নানা মূনির নানা মত, তখন সূক্ষ্ম বিচার করে এবিষয়ে ঠিকটা সাব্যস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৈজ্ঞের ব্যবসায় চিকিৎসা—প্রাণরক্ষা করা; ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় প্রাণবধ করা। অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্মৃতরাং বৈজ্ঞ অপেক্ষা বড় হতে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যিক, এই মনে করে জনকতক কায়স্থগোত্রের দলপতি ক্ষত্রিয় হবার জন্ম বন্ধপরিবন্ধ হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদ শুনে আমি একটু বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম।

কারণ, প্রথমত আমি উন্নতির পক্ষপাতী; কোনো লোকবিশেষ কিংবা জাতি-বিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে দেখলে কিংবা শুনে খুশি হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষত বাংলার পক্ষে যখন জিনিসটে এতটা নূতন। নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্তত দুদণ্ডের জন্মও। অবনতির জন্ম কাউকেই আয়াস করতে হয় না। ও একটু টিলে দিলে আপনা হতেই হয়। জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ নিশ্চেষ্টতা, আর জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম অধোগতি—গ্র্যাভিটেশন। সম্প্রতি

প্রোফেসর জে. সি. বোস, শুনতে পাই, বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রমাণ করেছেন যে, জড়ে ও জীবে আমাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তিমাত্র। সে ভ্রান্তির মূল আমাদের চর্মচক্ষুর স্থূলদৃষ্টি। তিনি ইলেকট্রিসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা অনুসারে জড়পদার্থের ভাবভঙ্গি ঠিক সজীব পদার্থের অনুরূপ। প্রোফেসর বোস নিজে বলেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়; এ সত্য আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বহুপূর্বে ধরা পড়েছিল, তাঁদের দিব্য চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারে নি; এককথায় এটা আমাদের খানদানী সত্য। আমি বলি, তার আর সন্দেহ কি। এ সত্যের প্রমাণের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যও আবশ্যিক নয়, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচ্ছি যে, আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ যদি কাষত ওর উলটোটা প্রমাণ করতে উগত হয়, তাহলে নূতন জীবনের স্ফূর্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

আমাদের বাঙালিজাতির চিরলজ্জার কথা, আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই। এর জ্ঞান আমরা অপর বীরজাতির ধিক্কার লাঞ্ছনা গঞ্জনা চিরকাল নীরবে সহ করে আসছি। ঘোষ বোস মিত্র দে দত্ত গুহ প্রভৃতির যে আমাদের এই চিরদিনের লজ্জা দূর, এই চিরদিনের অভাব মোচন করবার জ্ঞান কোমর বেঁধেছিলেন, তার জ্ঞান তাঁরা স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হবার জ্ঞান ঠিক পথটা অবলম্বন করেন নি, কাজেই অকৃতকার্য হয়েছেন। তাঁদের প্রথম ভুল, শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করতে যাওয়া। কি ছিলুম সেইটে স্থির করতে হলে পুরনো পাজিপুঁথি খুলে বসা আবশ্যিক, কিন্তু কি হব তা স্থির করতে হলে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যিক। ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষি দেবে? বিশেষত বিষয়টা হচ্ছে যখন ক্ষত্রিয় হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এমনি অভ্যাস ধারণ হয়েছিল যে, আমরা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে একপদও অগ্রসর হতে পারি নে।

পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার করবার জ্ঞান দুটি মারাত্মক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, অস্ত্রশস্ত্র ও শাস্ত্র। আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া ঝগড়াবিবাদ করি নে, যেখানে লড়াই হচ্ছে সে পাড়া দিয়ে হাঁটি নে—এই উপায়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রকে বেবাক ফাঁকি দিয়েছি। যা-কিছু বাকি আছে ডাক্তারের হাতে। আমরা চিররুগ্ন, সুতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা ঘর করতে পারি নে—এই উভয়-সংকটে আমরা হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজির শরণাপন্ন হয়ে সে অস্ত্রশস্ত্রেরও সংস্পর্শ এড়িয়েছি। আমাদের যখন এত বুদ্ধি, তখন শাস্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পাই, এমন-কি কিছু উপায় বার করতে পারি নে?

কিন্তু ক্ষত্রিয় হওয়া কায়স্থের কপালে ঘটল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একে কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, স্ততরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে বিরোধী হলেন তখন অপরপক্ষ ভয়ে নিরস্ত হলেন। ষাঁরা ক্ষত্রিয় হতে উত্তত, তাঁদের ভয় জিনিসটে যে আগে হতেই তাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, একথা বোঝা উচিত ছিল। ভীকৃত্তা ও ক্ষাত্রধর্ম যে একসঙ্গে থাকতে পারে না, একথা বোধ হয় তাঁরা অবগত ছিলেন না। তবে হয়ত মনে করেছিলেন, যখন মুখ্ ব্রাহ্মণে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ভীকৃ ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি। জড়পদার্থেরও একটা অন্তনিহিত শক্তি আছে, তার কার্য হচ্ছে চলংশক্তি রহিত করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানো যায় না, তার কারণ এই জড়শক্তিই আমাদের সমাজে সর্বজয়ী শক্তি।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে কায়স্থসমাজের সংস্কারের উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজসংস্কার-মহাসভার সভাপতির আসন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুসমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে, এবং সে দোষ না থাকলে সমাজের উপকার হতে পারে, অতএব সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা অকর্তব্য। সমাজের সৃষ্টি ও গঠন হয়েছে অতীতে, স্ততরাং তার সংস্কার ও পরিবর্তন হবে ভবিষ্যতে; বর্তমানের কোনো কর্তব্য নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে মানুষে; অতএব মানুষে তার সংস্কার করতে পারে না, সে তার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে। এ মত যে অস্বীকার করে, সে বার্ক পড়ে নি।

আজকাল একশ্রেণীর লোক আছেন ষাঁরা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, নিজেদের অবস্থা এইসব বিষয়েই একটু-আধটু চিন্তা করে থাকেন এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সাবধানের মার নেই। এঁরা সব জিনিসই ধীরেস্থে ঠাণ্ডাভাবে করার পক্ষপাতী। এঁরা রোখ্ করে স্তমুখে এগতে চান না ব'লে কেউ যেন মনে না ভাবেন যে এঁরা পিছনে ফিরতে চান। যেখানে আছি সেখানে থাকাই এঁরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এঁরা অহুমোদন করেন, কিন্তু সে বড় আন্তে বড় সন্তর্পণে। যে হাড়বাঙালিভাব অধিকাংশ লোকের ভিতর অব্যক্তভাবে আছে, এঁরা কেউ কেউ পরিষ্কার স্তন্দর ইংরেজিতে তা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গাধাবোট উন্নতির ক্ষীণ স্ত্রোতে ভাসাও, সে একটু-একটু করে অগ্রসর হবে, যদিচ চোখে দেখতে মনে হবে চলছে না। কিন্তু খবরদার, লগি মেরো না, দাঁড় ফেলো না, গুন টেনো না, পাল খাটিয়ো না— শুধু চুপটি করে হালটি ধরে বসে থেকে। এই মতের নাম হচ্ছে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার আমাদের দেশে

বড় আদর, বড় মাগু। গাধাবোট চলে না দেখে লোকে মনে করে না-জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাই আছে।

বিজ্ঞতা-জিনিসটে আমাদের বর্তমান অবস্থার একটা ফল মাত্র। এ অবস্থাকে ইংরেজিতে বলে transition period, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ধি উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই ব'লে বর্ণনা করেছেন যে 'লখইতে না পার জেঠ কি কনেঠ'—এ জ্যেঠ কি কনিষ্ঠ চেনা যায় না। কাজেই আমরা কাজে ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমির, নয় জ্যাঠামির, নাহয় একসঙ্গে দুঘের। এই জ্যাঠাছেলের ভাবটা আমাদের বিশেষ মনঃপূত। ছোটছেলের দুঃস্বভাব আমরা মোটেই ভালোবাসি নে। তার মুখে পাকা-পাকা কথা শোনাই আমাদের পছন্দসই। এই জ্যাঠামিরই ভদ্র নাম বিজ্ঞতা।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরা কে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও মনোভাবটি না থাকলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। বার্ক French Revolution-রূপ বিপুল রাজ্যবিপ্লবের সমালোচনাসূত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেই মতামত বালবিধবাকে জোর করে বিধবা রাখবার সপক্ষে ও কৌলিগপ্রথা বজায় রাখবার সপক্ষে প্রয়োগ করলে যে আর-পাঁচজনের হাসি পাবে না কেন, তা বুঝতে পারি নে।

আমাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হতে চলে আসছে, আচারে ব্যবহারে আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নূতন, সে শিক্ষায় আমাদের মনের বদল হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের ভাবে মিল নেই। যারা মনকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সহজেই ইচ্ছা হয় যে ব্যবহার মনের অনুরূপ করে আনি। অপরপক্ষে যারা দুর্বল ভীক ও অক্ষম অথচ বুদ্ধিমান, তাঁরা চেষ্টা করেন তর্কযুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে আনি। এই উদ্দেশ্যে যে তর্কযুক্তি খুঁজেপেতে বার করা হয়, তারই নাম বিজ্ঞভাব। আমরা বাঙালিজাতি সহজেই দুর্বল ভীক ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমরা না ভেবেচিন্তে বিজ্ঞের পদানত হই—এই হচ্ছে সার কথা।

কথার কথা

সম্প্রতি বাংলা-ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজে একটা বড়রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবার কোনো ইচ্ছে নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে সাধারণত লোকে দুঃখ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক মন্টেইনের মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেননা, সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। ‘বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা!’ আমিও মন্টেইনের মতে সায় দিই। যেহেতু আমি ব্যাকরণের কোনো ধার ধারি নে, সূত্রাং কোনো ঋষিঋণমুক্ত হবার জ্ঞান এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তর্ক-জিনিসটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে-না-দেখতে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে অবলৌলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা শুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলংকার-শাস্ত্রে এসে পৌঁছেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করেছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাংলা-সাহিত্য বাংলাভাষাতেই লেখা হয়। দুর্বলের স্বভাব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় ঝাঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্তে পরের উপর নির্ভর করি। স্বদেশের উন্নতির জন্তে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই কারণে নিজভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্তে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক-না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি, আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখি-না কেন। ফল কি হবে, কেউ বলতে পারে না; কারণ কোনো সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা পূর্বে কখনো করি নি। যাক ওসব বাজে কথা। আমি বাংলাভাষা ভালোবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার মত ঠিক কিংবা শাস্ত্রীমহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসি নি। শুধু তিনি যে যুক্তিদ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্বৃত্ত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখতে চাই।

কেউ হয়ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাংলাভাষা কাকে বলে। বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা

আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনাচিন্তা স্মৃৎদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলাভাষা? বাংলাভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে। কিন্তু অনেকে, দেখতে পাই, এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। শুনতে পাই কোনো-কোনো শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবি বলে থাকেন যে, দিল্লির বাদশাহ্ যখন উর্দুভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল একেবারে খাঁটি ফারসিভাষা তৈয়ারি করা, কিন্তু বেচারী হিন্দুদের, কান্নাকাটিতে রূপাপরবশ হয়ে হিন্দিভাষার কতকগুলো কথা উর্দুতে ঢুকতে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যেও হয়ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, আদিশূরের আদিপুরুষ যখন গোড়ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্বৃত্ত হলেন, তখন তাঁর সংকল্প ছিল যে ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃতভাষা করে তোলেন, শুধু গোড়বাসীদের প্রতি পরম অনুকম্পাবশত তাদের ভাষায় গুটিকতক কথা বাংলাভাষায় ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন যারা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করবার পক্ষপাতী, তাঁরা ঐ যে গোড়ায়-গলদ হয়েছিল তাই শুধরে নেবার জন্তে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকেই ভাষার গোড়াপত্তন ধরে নিয়ে, তার উপর যত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও—কালক্রমে বাংলায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাকবে না; আসলে জ্ঞানীলোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ ব'লে আমরা সংস্কৃত-বাংলার অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে। বাংলায় ফারসি কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফারসিপড়া বাঙালির সংখ্যা বড় কম। নইলে সম্ভবত তাঁরা বলতেন, বাংলাকে ফারসিবহুল করে তোলো। মধ্যে থেকে আমাদের মা-সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক-একবার মনে হয় ও উভয়সংকট ছিল ভালো, কারণ একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে মা'র আশু কাশীপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা-কিছু বর্তমানে আছে, তার কুলুজি লিখতে গেলেই গোড়ার দিকটে গৌজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শংকর, স্পেন্সার প্রভৃতিও, ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনো-কোনো জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম।

কিন্তু একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক, অমর হবার ইচ্ছা থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় নি। প্রথমত, অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলে সামলাতে পারি নে, কিন্তু কলম চালাবার জগ্নু আমাদের অনেকেরই আঙুল নিশপিশ করে। যদি ভালো-মন্দ-মাঝারি আমাদের প্রতি কথা প্রতি কাজ চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তাহলে মনে করে দেখুন তো আমরা ক'জনে মুখ খুলতে কিংবা হাত তুলতে সাহসী হতুম। অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাকলে, আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বলতে কিংবা করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভালো কাজ, অতি ভালো কথাও perfectionএর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ। পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্তলোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমরপুরীতে স্ফুঁতিতে বাস করেন, তা না হলে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হত। সে যাই হোক, আমরা মানুষ, দেবতা নই; সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে এ ইচ্ছা আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি কেউ শুধু অমর হবার জগ্নু লিখব, এই কঠিন পণ করে বসেন, তাহলে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে হাজারে ন-শ নিরানব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তাছাড়া সাহিত্যজগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েছে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু দণ্ডের জগ্নুও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যেদেশে মহামারীর প্রকোপ সেদেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় ?

৪

বিজ্ঞানভূষণমহাশয়ের আরও বক্তব্য এই যে, জীযন্ত ভাষার ব্যাকরণ করতে নেই, তাহলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ, সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃতভাষা একেবারে চিরকালের জগ্নু মরে গেছে। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে, যে-কোনো ভাষারই হোক না কেন, চিরকালের জগ্নু বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তাহলে বাংলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তাতে বিজ্ঞানভূষণমহাশয়ের আপত্তি কি। তাঁর মতামতসারে তো যমের ছয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে হয়। তিনি আরও বলেন যে, পালি

প্রভৃতি প্রাকৃতভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাংলা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণমহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহলে সংস্কৃতবহুল বাংলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃতভাষাতেই তো আমাদের লেখা কর্তব্য। কারণ, তাহলে অমর হবার বিষয় আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি নে : পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হতে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না; পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে-কদিন বেঁচে আছে, সে-কদিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাংলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন। বাংলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সহিবে না।

৫

এবিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে আসামি হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষাশিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, অল্প ভাষার যে স্ববিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে—যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলাভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যারা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। স্মরণ্যে তাঁর অপর মতটি ঠিক কি না দেখা যাক। আমাদের দেশে ছোটছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলে সংস্কৃত হয়; আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ ছেটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রীমহাশয় উদাহরণস্বরূপে বলেছেন, হিন্দিতে ‘ঘরুমে যায়গা’ চলে, কিন্তু ‘গৃহমে যায়গা’ চলে না—ওটা ভুল হিন্দি হয়। কিন্তু বাংলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাংলাভাষার নেই। যার যা-খুশি লিখতে পারি, ভাষা বাংলা হতেই বাধ্য। বাংলাভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙালি কথায় লেখায় যথেষ্টাচারী হতে পারে। শাস্ত্রীমহাশয়ের নির্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল

৭

ভাঙিয়ে দেওয়া যায়। 'ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশি করে খেয়ো', এই বাক্যটি হতে কোথাও 'ঘর' তুলে দিয়ে 'গৃহ' স্থাপনা করে দেখুন তো কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়।

৬

আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই? ভাষা ছয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন—একাদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ-কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ-ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে তার বড়-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে 'অভাব' একটা পদার্থ। আমি হিন্দুস্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক-দর্শন মানতে হয়; সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাংলা-সাহিত্যেও অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজিসাহিত্যের ভাব, সংস্কৃতভাষার শব্দ, ও বাংলাভাষার ব্যাকরণ—এই তিন চিহ্ন মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাংলাসাহিত্য বলে থাকি; বলা বাহুল্য, ইংরেজি না জানলে তার ভাব বোঝা যায় না। আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলাসাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। একথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানত অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নতুন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নতুন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার

এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যিক, ভার বাড়ানো নয়। যেকথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখানে থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন— কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

আমরা ও তোমরা

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত, তাহলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই দুই হত না—এক হত। আমি ও তুমি প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম নাহয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার স্মৃতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা খেতাজ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আঁগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূত্রে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

৭

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাত, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল—এত স্থূল যে, কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা; আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও ছুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই ছুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

৬

তোমাদের মেয়ে প্রায়-পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায়-মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

৭

তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য-ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কু'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে।

৮

অর্থাৎ এককথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পায় আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পায় না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পায় একের পিঠে অনেক শূন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ির বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতর। আমাদের গান আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক!

‡ স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক । কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য । তোমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়— তার শেষ নির্বাণ । পূর্বেই বলেছি, প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক । আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো— শুধু তোমাদের ভালো আমাদের মন্দ ও আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ । সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে— তাও অসম্ভব ।

শ্রাবণ ১৩০২

খেয়ালখাতা

শ্রীমতী 'ভারতী'সম্পাদিকা নূতন বংসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্ম একটি খেয়ালখাতা খুলবেন। এই অভিপ্রায়ে যাঁরা লেখেন কিংবা লিখতে পারেন, কিংবা যাঁদের লেখা উচিত কিংবা লিখতে পারা উচিত— এমন অনেক লোকের কাছে দু-এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি, তা জানি নে। তবুও ভারতীসম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্তব্য বিবেচনায় দু-চার ছত্র রচনা করতে উদ্বৃত্ত হয়েছি। ভারতীসম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা-খুশি লিখলেই হবে; কোনো বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিংবা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বলতে পারি নে, আমার তো ভরসার চাইতে ভয় বেশি হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে, আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হোক, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোনো কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিমূতার মালার ফরমাস দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিত্তের সন্ধান শতকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতীসম্পাদিকার ইচ্ছা, এই শেষোক্ত দলের একটু বকবার সুবিধে করে দেওয়া।

২

এ খেয়ালখাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি শিকি দুআনি কিছুই ফেরত যাবে না, শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না। কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই—তার উপর চক্চকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিসটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে যা আর-কারও নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়ালখাতায় স্থান পাবে না। নিতাস্ত পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে— আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোনো ফল ধরে না, তখন বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি করবার কোনো উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যিক। আর একথা বলা বাহুল্য,

যেখানে কেনাবেচার কোনো সম্বন্ধ নেই— ব্যাপারটা! হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের— সেস্থলে কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও, যেকথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন, তা চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্যজগতে যখন সাক্ষা হতে পারি নে, তখন আশা করা যায় কল্পনা জগতে অলৌকতার চর্চা করব না। এই কারণেই বলছি, ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।

৩

খেয়ালী লেখা বড় দুস্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব, অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, স্মতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগৎসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে-গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলেই এত সংকীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানা প্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, একথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়; কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অগ্রে পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাই নে। যা নিজে ধরতে পারি নে, তা অগ্নের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি নে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি স্ম্পষ্ট স্মসম্বন্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

৪

খেয়াল অভ্যাস করবার পূর্বে খেয়ালের রূপনির্গম করাটা আবশ্যিক, কারণ স্বরূপ জানলে অনধিকারীরা এবিষয়ের বুখা চর্চা করবেন না। আমাদের লিখিত-শাস্ত্রে খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, স্মতরাং সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, ঋপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ঋপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের অগ্নি অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্মৃতি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। স্মতরাং ঋপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা তান গিটকিরি ইত্যাদি, তাই

নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছ্বল হলেও যথেষ্টাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলঙ্কার-বিঘ্নাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলে মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নর্তকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না; তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হলেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। ঝাঁর মন সিধে পথ ভিন্ন চলতে জানে না, ধাঁর কল্পনা আপনা হতেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখতে পারেন না— তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হলেও কখনোই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোকমাত্রেই উপরোক্ত কথাকটির সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

৫

আমায় কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল-বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনায়ুক্ত ছিব্লেমি। এ সম্বন্ধে কৈফিয়তস্বরূপে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি-বিশেষ যখন অবস্থাবিপর্ষয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত হয়, তখন তার দুটি অধিকার অবশিষ্ট থাকে—কাঁদবার ও হাসবার। আমরা আমাদের সেই কাঁদবার অধিকার ষোলোআনা বুঝে নিয়েছি এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সম্বুট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতির মনো ঝাঁরা স্থানে-অস্থানে, এমনকি অরণ্যে পর্য্যন্ত, রোদিন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে গণ্য এবং মাগ্ন। যেখানে ফৌস করা উচিত, সেখানে ফৌস-ফৌস করলেই আমরা বলিচারি যাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারও মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভায়ুগের অপূর্ব সৃষ্টি গ্র্যাশনেল কনগ্রেস, অপর সত্ত্বজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না শুরু করে দিলেন। আর যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বংসরের

তিন শ বাষট্টি দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তারপর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে কোকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি, অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না।— তাহলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হলে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্না-ব্যাপারটাকে একটা কর্তব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম করে বিকেলে গা-ধুয়ে চুল-বেঁধে পা-ছড়িয়ে যখন পুরাতন মাতৃ-বিয়োগের জন্ম নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকি, তখন পৃথিবীর পুরুষমানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে, কান্নাব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলেফুলে কান্না ইত্যাদি; কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে-কান্না। এবং একথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সদাৱক্ষ বলে গেছেন— খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকী সুর লাগে না। এইসব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণরসে ভারতবর্ষ সঁাতসঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুরের জন্ম না হোক, স্বাস্থ্যের জন্মও হাশুরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই ছদ্মবেশে হাসি কি শোভা পায়। তার উত্তর, যোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্তার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না, কিংবা শোভা পায় না। আমাদের এই অবিরত-ধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।

বৈশাখ ১৩১২

মলাট-সমালোচনা

‘সাহিত্য’সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু

‘বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি’-জিনিসটা এদেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাতা বইয়ের তেরো পাতা সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক আর এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সূত্র-আকারে মূল গ্রন্থ রচনা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন ভাষ্যে-টীকায়-কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যেকথা দু কথায় বলা যায় তাই দু শ কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সূত্রকার হওয়াই সংগত। তাঁরা যদি কোনো নব্যগ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন, তাহলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ করতে গেলে তাঁদের ব্যবসা মারা যায় সূতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতি-পরিবর্তন করবেন, এরূপ আশা করা নিফল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যাুক্তির প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যাুক্তি যে নিন্দনীয়, একথাটা বলেছেন কি না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোনো সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে অত্যাুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে গেছে। সমালোচকদের অত্যাুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা-জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে বার করা উচিত। কেননা, নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকোরের মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু আসলে অতিনিন্দা এবং অতিপ্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যাুক্তি ‘অতি’ শুধু সুরুচি এবং ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে যায়। এককথায়, অত্যাুক্তি মিথ্যোক্তি। মিছাকথা মানুষে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে নাহয় কোনো স্বার্থসিদ্ধির জগুই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবতঃ অভ্যাসবশত মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকমাত্রায় কেউ-কেউ চর্চা করে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যাকথা বলা চর্চা করলে ক্রমে তা উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাংলাসাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতিপ্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক-একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকের যেসকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় শেখরপীর কিংবা কালিদাসের

সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশি হয়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইয়ের ভালোরকম কাটতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেন্ট ঔষধ বিক্রি করা হয়, সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দেব, এইরকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে, একথা সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই, পেটেন্ট ঔষধের মতই একালের ছোটগল্প কিংবা ছোট কবিতার বই মেধা হ্রী ধী শ্রী প্রভৃতির বর্ধক এবং নৈতিক-বলকারক বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা হয় তা দেখা যায় প্রায়ই অকালকুম্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।

অতি-বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল, এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের একমাথা চুল থাকে, তখন আমরা কেশবর্ধক তৈলের বড়-একটা সন্ধান রাখি নে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চক্চক করে ওঠে, তখনই আমরা কুন্তলবৃষ্টির শরণ গ্রহণ করে নিজেদের অবিম্বলকারিতার পরিচয় পাই এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশই বৃদ্ধি পায়, এবং সেইসঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে—‘মনোযোগ করছেন তো?’ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলেও, বিজ্ঞাপন চব্বিশঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই। কারণ, এ যুগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রবন্ধের গা ঘেঁষে থাকে, মাসিকপত্রিকায় শিরোভূষণ হয়ে দেখা দেয়; এককথায় সাহিত্যজগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে, সেইখানেই এসে জুড়ে বসে। ইংরেজিভাষায় একটি প্রবচন আছে যে, প্রাচীরের কান আছে। এদেশে সে বধির কি না জানি নে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে মুক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যাকথা তারস্বরে চীৎকার করে বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকান না বুজে চললে বিজ্ঞাপন কারও ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখকান বুজে চল, তাহলেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল, আর গাড়িতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে মারে। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কথা নেই; ছুঁড়ে মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম। তার রং ছুঁড়ে মারে, তার ভাষা ছুঁড়ে মারে, তার ভাব ছুঁড়ে মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের

সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলেও তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবলমাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি। যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উত্তম হয়েছি। অন্তত মুখপাতটুকু দোরস্ত করে দিতে পারলে আপাতত, বঙ্গসাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, নব্যবঙ্গসাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানত সেই নাম-জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ-জিনিসটে একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলে না বলে সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানারূপ কাঁচের আবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনি পুস্তকের দোকানে একালের পুস্তক-পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্যসাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে আমার হয় নি, একথা বলতে পারি নে। কবিতা আজকাল গোখুলিতে গা-ঢাকা দিয়ে 'লজ্জানত্র নববধু সম' আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না; কিন্তু গালে আলতা মেখে রাজপথের স্রমুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সঙ্গত ভাবের উপরেই তার গান্ধীর্ষ ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাড়াবাড়ি-জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক। আমার মতে পূজার বাজারের নানারূপ রংচঙে পোশাক পরে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বার হওয়া উচিত নয়। তবে পূজার উপহারস্বরূপে যদি তার চলন হয়, তাহলে অবশ্য কিছু বলা চলে না। সাহিত্য যখন কুস্তলীন তাশুলীন এবং তরল-আলতার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন পুরুষের পক্ষে পক্ষ্য বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অত্র-কোনো ভাষা ব্যবহার করা চলে না। তবে এইকথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্যাদার লাঘব হয়, এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝতে পারেন না; কবি কি চান যে, তাঁর হৃদয়রক্ত তরল-আলতার শামিল হয়; চিন্তাশীল লেখক কি এইকথা মনে করে স্থখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেলতৈল হিসাবে দেখবে; এবং বাণী কি রসনানিঃস্বত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হতে লজ্জা বোধ করেন না? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে। অ্যান্টিক কাগজে ছাপানো এবং চক্চকে বাক্বাকে তকৃতকে করে বাঁধানো পুস্তকে আমার কোনো আপত্তি নেই। দপ্তরিকে আসল গ্রন্থকার বলে ভুল না করলেই খুশি হই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, লেখকের কৃতিত্ব মলাটে শুধু ঢাকা পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালিতে ছাপানো একখানি পদকল্পতরু যে শত শত তকৃতকে বাক্বাকে চক্চকে গ্রন্থের চাইতে শতগুণ আদরের সামগ্রী।